09 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ভাবনা

আলবার্ট বাড়ৈ

শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির মহোৎসব। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান সরকারের প্রাধান্য দেয়া খাতগুলোর মধ্যে শিক্ষা খাত অন্যতম। আর তার ধারাবাহিকতায় শিক্ষা খাতের উন্নতি-অগ্রগতিও চোখে পড়ার মতোই। তা বলে আত্মতৃপ্তি বোধ করার কোনই সুযোগ নেই। এখনও অনেক ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে দুর্বলতা, অসঙ্গতি আর প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনযোগ্য অনেক কিছুই। রয়েছে সার্বিকভাবে বাজেট-বরাদ্দের কমতিও।

বর্তমান সরকারের মোটা দাগের সাফল্যের খাতগুলোর কথা বলতে গেলে অবশ্যই শিক্ষা খাতের কথা বলতে হবে। বিগত দিনগুলোতে সরকার গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক নীতি ও পদক্ষেপের কারণে শিক্ষার প্রভূত উন্নতি এখন সাদা চোখেই দেখা যায়। এটাও যেমনি সত্যি, তেমনি একথাও বলতে হবে যে, বিভিন্ন অগ্রগতির সূচকে অগ্রগতি পরিমাপ করা গেলেও শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আর এটাও নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, পরিবর্তনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবদিক একবারেই শতভাগ সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এবার সাফল্যের চিত্রটি একটু দেখা যাক। সদ্য প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় বিগত বছরের তুলনায় পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে মাদ্রাসা কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ বোর্ড রয়েছে মোট ১০টি। এ বোর্ডগুলোর অধীনেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার গড় পাসের হার হচ্ছে ৮৮.৯৯ জন। গত বছরের তুলনায় তা ১.২৫ ভাগ বেশি। এ বছর মোট ১৪ লাখ ৫২ হাজার পরীক্ষার্থী পাস করেছে। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৯৩ হাজার ৬৩১ জন। অর্থাৎ লেখাপড়ায় আগ্রহী ও মনোযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা একটা ভালো দিক। কিন্তু, এসব শিক্ষার্থীর শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে নানা কথাবার্তা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই গণমাধ্যমে সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরে পাস করা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগতমানের স্থূলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সেখানে বলা হয়েছে, এসব শিক্ষার্থীদের অনেকেই আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতার নাম, নিউটনের সূত্র এমন কি বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসকেও পৃথকভাবে বলতে পারে না। শুধু মাধ্যমিক পর্যায়ই কেন, আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেছেন দেশের বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অনেক নিম্ন পর্যায়ের। তিনি অবশ্য আইন শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে ওই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়েও যে মান খুব যুথোপযুক্ত তাও কি জোর দিয়ে বলা যাবে?

শিক্ষার এমনি অনাকাঙ্ক্ষিত ফল নিয়ে ইতোমধ্যেই গবেষক- বিশ্লেষকরা অনেক অভিমত নিয়ে কথা বলেছেন। তাদের অনেকেরই অভিমত হচ্ছে, শিক্ষা কার্যক্রম বা কারিকুলামে বর্তমান বিরাজমান 'নৈর্ব্যক্তিক' পদ্ধতিটি যথোপযুক্ত নয়। এর কারণে বাজারে সস্তা নোট বই, সহায়ক বই আর কোচিং পড়ার বাধ্যবাধকতা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে শিক্ষার্থীরা। ধরাবাধা এমনি গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না সবাই। ফলশ্রুতিতে একটু এদিক-সেদিক হলেই বা তারতম্য হলেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর অনেকেই দিতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে শত চেষ্টা করেও শিক্ষার নামে কোচিং ব্যবসা, সহায়িকার নামে নোট বই বিক্রি ইত্যাদি বন্ধ করা যাচ্ছে না। এটা গেল দুর্বলতার একটি দিক। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে পা দিয়েই উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি পর্ব। সঙ্গত কারণেই শিক্ষার্থী আর তাদের অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার শুরুও এখানেই। তাদের চাওয়া আর লক্ষ্য থাকে ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া। কিন্তু তা স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর কপালেই জোটে। অধিকসংখ্যক মেধাবী ও ভালো রেজাল্ট করা শিক্ষার্থীর মাঝে থেকে যায় ভালো কলেজে ভর্তি হতে না পারার বেদনা। যা থেকে সৃষ্টি হয় হতাশা, শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ। এখানেও ছোট একটি উদাহরণ দেয়া যায়। এ বছর বোর্ডগুলোতে সর্বোচ্চ গ্রেড 'এ' পেয়ে পাস করেছে ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন। তার মধ্যে স্বীকৃত না হলেও ভালোর মধ্যেও ভালো শিক্ষার্থী অর্থাৎ 'গোল্ডেন' 'এ' পাওয়ার সংখ্যাও কিন্তু অনেক। সঙ্গত কারণেই তারা চাইবে ভিকারুন নিসা নূন বা রেসিডেন্সিয়াল কলেজে ভর্তি হতে। ফলে, মেধাভিত্তিক ভর্তি পদ্ধতির পছন্দের তালিকায় তারা ওই দুটি কলেজের নাম প্রথম প্রাধিকার দিয়ে আবেদন করবে। কিন্তু ভর্তির বাস্তবতাটা দেখা যাক। আলোচ্য ভালো দুটি প্রতিষ্ঠানেরই মাধ্যমিক শাখায় পরীক্ষার্থী রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির সময় প্রথমেই তারা তাদের শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাদের ভর্তির পর শূন্য আসনে মেধার ভিত্তিতে অন্যদের ভর্তি করে থাকে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, গত বছর ভিকারুন নিসা নূন কলেজে তাদের নিজস্ব এসএসসি পাস শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানোর পর মাত্র ২৭৫ জনকে বাইরের শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল। আর এই ২৭৫টি সিটে ভর্তি হওয়ার জন্যে আবেদন পড়েছিল পৌনে দুই লাখ। আর তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৩ হাজারেরও বেশি। অর্থাৎ এই পরিমাণ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে ওই কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। একই অবস্থা ছিল রেসিডেন্সিয়ালসহ অন্য ভালো প্রতিষ্ঠানেও।

এমনি বাস্তব সমস্যা খতিয়ে দেখলে আরও অনেক অসঙ্গতি পাওয়া অবসম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। আর তা হলো, আত্মকর্মসংস্থা ভিত্তিক শিক্ষা কারিকুলাম গড়ে তোলা। কারণ, একথাতো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীরা সবাই সমান মেধাবী নয়। অথচ, অধিক মেধাযুক্ত শিক্ষার্থী ছাড়া উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়ন তেমন কার্যকর হয় না। আবার সবার ওই ধরনের শিক্ষার প্রয়োজনও নেই। আমাদের দেশের অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপে এমনিতেই দেশ অর্থনীতি চাপের মুখে। অন্যদিকে ফি বছর সাধারণ বিভাগে পাস করা শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থান করার সুযোগও সীমিত। তাদের বিদেশে কর্মসুযোগও তেমন করে বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে হচ্ছে শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধি পাওয়া। এই অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা আমাদের মতো রাষ্ট্রের পক্ষে দীর্ঘদিন বহন করা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং তা মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই চালু করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বর্তমান সরকার চলমান শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই যুগান্তকারী পরিবর্তন যে এনেছে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমানের আরও একটি নতুন যে সিদ্ধান্ত দ্রুততার সঙ্গেই বাস্তবায়ন চলছে, তা সবার কাছেই প্রশংসার দাবি রাখে। তা হলো অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর হিসেবে ঘোষণা। এতদিন পর্যন্ত ছিল যা পঞ্চম শ্রেণীতে সীমিত। তবে, তা ওই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে শিক্ষক সমস্যাসহ যেসব সমস্যার কথা শোনা যাচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার বিবেচনায় আরও নতুন কিছু সমস্যা সমাধানেও সরকারকে দ্রুতই পদক্ষেপ নিতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে নতুন যুক্ত হওয়া ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরও জন্যও শিক্ষাকে অবৈতনিক করা। আমাদের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার কথা লেখা রয়েছে। এটা যে সরকারের ওপর নতুন আর্থিক চাপ, তাতে সন্দেহ নেই। এর জন্যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, একথা যুগ যুগ ধরেই বলা হচ্ছে। তবে, স্বাধীনতার ৪৫ বছরের মধ্যে অতীতের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে প্রায় আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান শিক্ষার যুগান্তকারী পরিবর্তন দৃশ্যমান। বাৎসরিক শিক্ষাপঞ্জী সারা দেশে একই সঙ্গে চালু করা, বছরের প্রথম দিন থেকেই শিক্ষার্থীদের কাছে বই পৌঁছে যাওয়া, সেদিন থেকেই শিক্ষাপঞ্জী চালু হওয়া, নিয়মিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান, ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ, বৃত্তি-উপবৃত্তি চালু, এসবের ফলশ্রুতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার প্রায় শূন্যর কোঠায় চলে আসা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর হার বৃদ্ধি ইত্যাদি সবই ইতিবাচক দিক। ফলে, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বিড়ম্বনা, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মমুখী শিক্ষা কারিকুলাম চালু, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ঘোষিত প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা, বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি সর্বোপরি অংকের হিসাবে নয়, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সব বাধা দূর করার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এ ব্যাপারে বাস্তবভিত্তিক চিন্তাভাবনা এখন বেশি জরুরি প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে নীতি গ্রহণের পর্যায়ে প্রচলিত রাজনীতিকে দূরে রাখাও অত্যাবশ্যকীয় বলে আমি মনে করি।

[লেখক : ব্যারিস্টার]